অনুবাদ : ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণ সমুদ্র নিয়ে কথাবার্তা
(Conversation About The South Sea)

বের্টোল্ট ব্রেশ্ট্

আমার প্রকাশকের ঘরে একবার এক লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল যে পনেরো বছর ব্রাজিলে কাটিয়েছে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, বার্লিনের অবস্থা কেমন। আমি সে প্রশ্নের জবাব দিলে সে আমাকে পরামর্শ দিল দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে চলে যেতে। সে আরও বলল, আমি নাকি ওখানে থাকার লোভ সামলাতে পারব না। প্রস্তাবটায় আমার কোনও আপত্তি ছিল না অবশ্যই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সঙ্গে কী কী নিলে ভালো হয়। সে বলল, তুমি একটা ছোটো চুল-ওলা কুকুর নিতে পারো। ওরা মানুষের সবথেকে ভালো বন্ধু।

স্বাভাবিক কারণেই আমার ইচ্ছে করছিল ওকে বলি, লম্বা চুলের কুকুর চলবে কি না। চরম কোনও সমস্যায় অমন কুকুর নিয়ে কাজ চালানো যেতেই পারে। কিন্তু, সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হল, কুকুরের লম্বা চুলে সহজেই জট পড়ে যেতে পারে। তাতে চোরকাঁটা বিঁধলে তো কথাই নেই।

এরপরই লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম, দক্ষিণ সমুদ্র অঞ্চলে সারাদিন কোন-কোন কাজ করে সময় কাটানো যায়। সে বলল, না-না, ওখানে তোমার কোনও কাজ করারই দরকার নেই। আমি বললাম, ঠিক আছে। কাজ করতে আমারও ভালো লাগে না। তবু কারও কিছু করার ইচ্ছে তো হতে পারে সেখানে। সে বলল, জানো, ওখানে অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদ। আমি বললাম, দারুণ। কিন্তু ধরো, সকাল আটটায় আমি কী করব?

—কী আবার? তখন তুমি দিব্যি ঘুমোবে।

—আর, দুপুর একটায়?

—দুপুর একটায় ওখানে এত গরম যে কোনও কাজ করা যায় না।

ঠিক এমন সময় আমি মেজাজ হারালাম। খুব রুক্ষ চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলি, আর বিকেলবেলা?

—ওঃ, ঘণ্টাখানেক সময় কাটানোর একটা উপায় তুমি ঠিকই খুঁজে পাবে তখন। শেষ অব্দি মনে হল, সে বোধহয় বুঝতে পেরেছে আমি ঠিক নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার মানুষ নই। হয়তো সেজন্যেই সে প্রস্তাব দিল, তুমি একটা দো-নলা শট্‌গান্ নিয়ে সেখানে শিকারে মেতে যেতে পারো। মেজাজ বিগড়ে যাওয়ায় তাকে স্পষ্ট বলে দিই, ওসব শিকার-টিকার আমার ভালো লাগে না।

এরপরই মুচকি হেসে আমায় বলল সে, তাহলে ওখানে তোমার দিন কাটবে কী করে?

আমি ক্রমেই আরও খেপে উঠছিলাম। তাকে বলি, ওসব তো তোমার বলার কথা। প্রস্তাবটা তো তোমার। দক্ষিণ সমুদ্রের ব্যাপারে আমি কী করে জানব অত সব?

এমন সময় সে প্রস্তাব দিল, মাছ ধরা ভালো লাগে তোমার?

—আমার এতে বিশেষ আপত্তি নেই, কর্কশ স্বরে বললাম।

—ভালো। স্টিলের একখানা ছিপ কেনো তবে। যে-কোনও দোকানে পেয়ে যাবে। তারপর ছিপ হাতে বসে থাকার পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখতে বঁড়শিতে দুটো মাছ গেঁথে ফেলেছ। শিকারে বেরোতে ইচ্ছে না হলেও ক'টা মাছ তো খেতে পারবে।

—মাছগুলো কাঁচা খাব নাকি?

—তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই লাইটার থাকবে!

—লাইটারে ভাজা মাছে আর যা হোক পেট ভরে না, মুলত অনভিজ্ঞতার কারণে আমার গলায় উদ্বেগ ফোটে। আচ্ছা, ওখানে ক'টা ছবিতো তুলতে পারি!

—আইডিয়াটা বেশ ভালো, তার গলায় দৃশ্যত স্বস্তির ভাব। ছবি তোলার বিষয় হিসাবে গোটা প্রকৃতিকে পাবে তুমি। ছবি তোলার মতো এমন অসংখ্য দৃশ্য আর কোথায়?

আর, ঠিক এখানেই সে আমাকে টেক্কা মেরে গেল। তাকে হারাতে পারলাম না। দক্ষিণ সমুদ্রে সে তবে আমায় সারাদিন ধরে ছবি তুলিয়ে ছাড়বে? অর্থাৎ, আমি সারাদিন ব্যস্ত থাকব, আর সে নিশ্চিন্তে ঘুমোবে, এই তো? কিন্তু, তোমরা আমার ওপর আস্থা রাখতে পারো। দক্ষিণ সমুদ্রের ভাবনাটা আমি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছি বেশ ক'বছরের জন্য। আর, অমন এটা লোকের সঙ্গে আমার কখনও দেখা হোক, তা-ও চাই না।

[*The Berlin stories* (1924-1933) থেকে অনূদিত]

'বৃষ্টি নিয়ে কিছু ভাবনা'
(Before the Flood)

যখন কোনওদিন অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, আমার ঠাকুমা বলে উঠতেন, হ্যাঁ রে, আজ মনে হচ্ছে বৃষ্টির খুব বাড়াবাড়ি। তোর কী মনে হয়, কোনওদিন থামবে এই বৃষ্টি? আমার কিন্তু খুব খারাপ সম্ভাবনার কথা মনে হচ্ছে। নোয়া-র যুগে সেই ভয়াবহ বন্যার সময় এরকম বৃষ্টি চলেছিল অ-নে-ক-দি-ন। আর, তারপরই সেই দুনিয়া কাঁপানো জলোচ্ছ্বাস।

ঠাকুমা আরও বলতেন, যা একবার ঘটে গ্যাছে, তা আবারও ঘটতে পারে। আর, যা কোনওদিন ঘটেনি, তা তো ঘটবেই।

ঠাকুমার তখন চুয়াত্তর, আর তিনি খুব বেশি যুক্তির ধার ধারতেন না। যাক্ গে, সেবার যখন দুনিয়া কাঁপানো বন্যা হয়েছিল, পৃথিবীর প্রায় সব প্রাণী-ই নোয়া-র বিশাল নৌকোটায় গিয়ে ওঠে। নৌকোয় ওঠার সময় তারা বেশ শান্তি বজায় রেখেছিল। ওই একটা সময়েই

পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীরা নিজেদের মধ্যে কোনও ঝগড়াঝাঁটি করেনি। আর, তাদের সবাই নোয়া-র নৌকোয় দিব্যি ঠাঁই পেয়ে গেছল। কিন্তু, 'ইক্‌থিওসরাস্', মানে সেই দৈত্যাকার মেছো-গিরগিটিকে ফেলে রেখেই চলে যায় সেই নৌকো। আসলে নৌকো ছাড়ার কথাটা তাকে খুব স্পষ্ট করে বলা হয়নি। ফলত, সে ওই বিশেষ দিনে এক অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নোয়া অবশ্য আগেই তাকে সাবধান করে দিয়েছিল এই বলে যে, বন্যা আসছে, আর সেটা যে-সে বন্যা নয়। মেছো-গিরগিটি তখন নাকি শান্তভাবে বলে তাকে, আমি বিশ্বাস করি না। আসলে, মেছো-গিরগিটিকে সেসময় অনেকে পছন্দ করত না। প্রবল বন্যায় যথারীতি সে ডুবে মরে।

তারপর, নোয়া যখন তার বিশাল নৌকো ছাড়ার পর প্রথমবার তাতে আলো জ্বালে, নৌকোয় চড়ে বসা প্রাণীরা বিলাপ করে ওঠে, আহা রে, এখনও কী প্রচণ্ড বৃষ্টির দাপট, আর আমাদের মেছো গিরগিটি উঠতেই পারল না নৌকোয়!

সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে মেছো-গিরগিটিই প্রবীণতম। তার জীবনের যেরকম অভিজ্ঞতা তার জোরে দুনিয়া-কাঁপানো এমন বন্যার মতো দুর্ঘটনার আন্দাজ করা তার কাছে কোনও ব্যাপারই না। কিন্তু কী করে যে সে এমন ভুল করে।

ঘটনাটায় অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নেই। আজকের দিনে এমনটা ঘটলে আমিও হয়তো নৌকোয় ঠাঁই পেতাম না। মনে হয়, সেই রাতে, যখন সে ডুবে মরে, সে কোনও ঐশ্বরিক দুর্নীতি ও প্রতারণার একটা হদিশ পেয়েছিল ঠিক। একইসঙ্গে সে হয়তো সমস্ত পার্থিব প্রাণীর বিশেষ কারও খেলার পুতুল বনে যাবার নির্বুদ্ধিতাকেও চিহ্নিত করতে ফেলেছিল।

হয়তো, তার মরণ-মুহূর্তে মনে হয়ে থাকবে যে, এই দুর্নীতি, প্রবঞ্চনা ও নির্বুদ্ধিতা জীবনেরই প্রয়োজনীয় কিছু ব্যাপার।

[গল্পটির উৎস *The Berlin Stories* (1924-1933)]

উন্মোচন

(Revealation)

এক মাঝবয়সি লোক কোন সন্ধেয় দেবদারু গাছ ঘেরা একটা বড়ো রাস্তা ধরে হাঁটছিল। আর তখনই সে দেখল দৃশ্যত একটা কালো নদীর ধারে বেশ বড়ো এক কুকুর কিছু পায়রাকে তাড়া করেছে। ব্যাপারটা লক্ষ করে তার মন কেমন কু গায়। তার মনে হয়, সামনে বোধহয় কোনও বিপদ আসছে। সে তক্ষুনি ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু সেদিন বিশেষ কিছুই ঘটে না। তার ব্যবসাপত্তর ভালো চলছিল। তার চেনা মহলে তার বউ-ই একমাত্র নারী যে কিনা নির্বোধ নয়। আর, সেই সকালেই নাপিতের দোকানে কেউ একজন তাকে তেরো বছর বয়সি আপ্‌ফেল্‌বক্-এর ঘটনাটা বলে। এই আপ্‌ফেল্‌বক্ নামে ছেলেটা তার বাবা-মাকে গুলি করে মেরেছে। সেই গল্প শুনে ঘরে ফেরার সময় মাঝবয়সি লোকটার হাঁটুতে সে কী

কাঁপন। সারাক্ষণ আপ্‌ফেল্‌বকের কথা ভাবছিল সে। ছেলেটা তার মা-বাবার মৃতদেহ আলমারিতে পুরে রেখেছিল টানা সাতদিন। সেই ঘটনার কথা শুনতে-শুনতে বারবার লোকটার মনে হচ্ছিল, সে-ও ঠিক কালকেই তার দাঁতের ডাক্তারকে খুন করতে পারে, ধরা যাক, ছুরির ঘায়ে। ডাক্তারটার বলিষ্ঠ ফরসা ঘাড়। একইসঙ্গে, লোকটা ডাক্তারকে খুন না করার কথাও ভাবছিল। আর তখনই তার ইচ্ছে হল পিয়ানোয় বসে অস্ট্রিয়ান গীতিকার জোসেফ হেড্‌ন্-এর তৈরি সুর বাজানোর। কিন্তু, পিয়ানোয় সুর তুলতে-তুলতেই তার মাথার মধ্যে ঢুকে পড়ল আপ্‌ফেল্‌বক্। ছেলেটা নাকি এক সপ্তাহ অপেক্ষা করেছিল। আর, সেই সময়কালের মধ্যে মূলত দুর্গন্ধের কারণে সে প্রথমে ছুটে যায় তার বাড়ির বসার ঘরে। শেষ অব্দি অবশ্য সে ঠাঁই নেয় ব্যালকনিতে। জোসেফ্ হেড্‌ন্-এর সুর কীভাবে ঢাকবে সেই গন্ধ!

সুতরাং আপ্‌ফেল্‌বক্-এর গল্প শুনে আসা লোকটা পিয়ানোর ভাবনা ছেড়ে তার অন্ধকার ঘরে ঘুরে বেড়ায় ক'মুহূর্ত। এক জানলা থেকে অন্য জানলায় চোখ রাখে। অপরিসীম শূন্যতার দিকে স্থির চেয়ে থাকে। তার জানলার বেশ নিচে নীল ছাদগুলোকে দেখে। মাঝে মাঝে হাত কচলায়। তার চৈতন্যে সেসব দুঃসহ কিছু মুহূর্ত। আর, এভাবেই পার হয়ে গেল সাতটা দিন।

এরপর সে বিছানায় গেল। ভাবে সে, আপ্‌ফেল্‌বকের ঘটনার জন্য আমরা কোনওভাবে দায়ী নই। এই গ্রহের সমস্ত ঘটনাই এক সাময়িক ব্যাপার। অগুনতি ঘটনায় বেজে চলেছে এই গ্রহ। গ্রহটার আনুষঙ্গিক ব্যাপার কি কিছু কম আছে? ছায়াপথে ঘুরতে ঘুরতে কত কিছুরই তো আধার হতে পারে সে! এমন গ্রহের ওই দুর্ঘটনা আমাদের সবাইকে কাঠগড়ায় কী করে দাঁড় করাবে, মনে করছিল সে। বিছানায় পড়ে থাকতে-থাকতে সে টের পায়, চারদিকে বড্ড অন্ধকার। অগত্যা সে মোমবাতি জ্বালতে উঠে পড়ল। পাঁচটা মোমবাতি খুঁজেও পেল। পাঁচটা মোমবাতিই জ্বালিয়ে বিছানার বিভিন্ন কোণে রাখল। দুটো রাখল মাথার কাছে। দুটো পায়ের কাছে। আর একটা বিছানার পাশের টেবিলে। সব মিলিয়ে ওই পাঁচটা। তার কেন জানি মনে হচ্ছিল, এই সবকিছুর একটা মানে আছে।

তা, এতসব কাজকর্মের মুহূর্তেই মাঝবয়সি লোকটা ক্রমশ আপ্‌ফেল্‌বক্ হয়ে ওঠে। সে তার মা-বাবার মরদেহের গন্ধ পেতে থাকে। লোকটা ভাবে, আমিও তবে ব্যালকনিতে চলে যাই। অবশ্যই সে কিছুতে সেটা করতে পারে না। এ সবকিছু আসলে তার কল্পনার টুকরো-টাকরা। কারণ তার বাড়িতে ব্যালকনি বলে কিছু ছিলই না। তখন মনে মনে বলে সে, যদি আমি মরে যাই এ মুহূর্তে! সে ভাবে, আমি কি তবে একটা দুষ্ট চক্রে পড়েছি? আমি সত্যি বড়ো অসহায়। আমার ঘরের রঙিন কার্পেট-টা একটুও ভালো লাগছে না। আমার মৃত্যুর পরেও কার্পেট-টার রং বদলাবে না। কার্পেটখানা আমার চেয়ে টেক্‌সই! অমন জড় পদার্থের কোনও কামনা-বাসনা নেই। সে নির্বোধের মতো মালিকের উপকারে লাগতে পারে শুধু। ওদিকে, আশপাশে শুধু মাছির ভন্-ভন্। সে একটা মাছি ধরল। আর বিছানায়

হাঁটু গেড়ে বসে তা করতে গিয়ে তার জামা পরা হাত ঘষে যায় দেয়ালে। পাঁচটা আলোকিত মোমবাতির উদ্দীপনা তার মধ্যে। মাছিটাকে ধরে তার মনে হল, মরণ মুহূর্তে কারও কাছে এটাও একটা জরুরি কাজ হতে পারে। ধরো এখন যদি আমি মারা যাই, ভাবে সে। আমার একটা সন্তানের বড়ো আকাঙ্ক্ষা। হয়তো সে আকাঙ্ক্ষা পূরণও হল। আমি মারা গেলে তবু কারও কিছু যাবে আসবে না। আমি বেঁচে থাকলেও ব্যাপারটা একই। যা খুশি করি না কেন, লোকের তাতে বয়ে গেল।

অস্থির লোকটা এবার উঠে পড়ে একটা ঢিলে সামরিক কোট চাপাল জামার ওপর। তারপর নেমে এল পথে। তখনও আঁধার গাঢ় হয়নি। আকাশে মেঘ ভাসছে। চারদিক একরকম স্পষ্ট। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ। জমাট শীত। আকাশ ফুঁড়ে জেগে আছে কালো চিমনিগুলো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটে সে। একটা সুর ভাঁজে, ‘কনের চোখের জল মৃদু করে / যখন বর আঘাত করে কানে।’ তারপরই হাঁটার গতি বাড়াল সে। অন্য মানুষদের পেরিয়ে যেতে চায়। হাত উড়িয়ে জোরে গান গায়। একসময় ছুঁড়ে ফেলে দিল কোট-টা। এরকম একটা গ্রহে কারও কোট পরে থাকার দরকার নেই। জোরে গান গাইতে গাইতে লম্বা পা ফেলে এগিয়েই যায়। আশপাশের সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে সে একটা ধ্যানের স্তরে চলে গেল।

[গল্পটির উৎস *The Berlin Stories* (1924-1933)]